বিনায়ক দামোদর সাভারকর ঃ আধুনিক হিন্দুবাদ

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (1883–1966) আধুনিক ভারতীয় হিন্দুবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত। প্রথম জীবনে তিনি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চিন্তা, বিশেষ করে তিলকের রাজনৈতিক কর্মসূচীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নানা দুঃসাহসিক বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদেশে ছাত্রাবস্থায় তিনি বিভিন্ন ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় চরমপন্থী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে তাঁর জাতীয়তাবোধ, ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয়। লণ্ডনে বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য স্যার কার্জন ওয়াইলিকে মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক হত্যার ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জেলবন্দী করে। দীর্ঘ কারাবাসের পর 1924 সালে তিনি মুক্তি পান। বস্তুত জনমতের চাপেই সরকার বাধ্য হয় তাঁকে মুক্তি দিতে। তবে সরকারের শর্ত ছিল যে 1937 সাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

দীর্ঘ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসানের পর প্রথমে তিনি তিলকপন্থী গণতান্ত্রিক স্বরাজ দল এবং পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট পদেও তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন।

অদম্য জাতীয়তাবাদী সাভারকরের ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপের মধ্যে। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম মন্তব্য করেন যে 1857-র সিপাহী বিদ্রোহ আসলে ছিল এক স্বাধীনতা সংগ্রাম। তিনি মন্তব্য করেন যে সুদূর পেশোয়ার থেকে কলকাতা জুড়ে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরা স্বধর্ম এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অদম্য আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই সংগ্রাম শুরু করে। তাঁর মতে নানাসাহেব এবং তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের উদ্দেশ্য ছিল নিপীড়িত ভারতীয়দের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা থেকে মুক্ত করে এক সার্বিক ব্রিটিশ বিরোধী গণসংগ্রাম গড়ে তোলা এবং স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি কোনমতেই সিপাহী বিদ্রোহকে এক ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান বলে দেখতে রাজী ছিলেন না। ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ভারতীয়রা পরাধীনতার গ্লানি কাটাতেই ভারতীয়দের এই অভ্যুত্থান বলে তিনি মনে করেছেন। স্বধর্ম এবং মাতৃভূমিকে বিদেশীদের হাত থেকে বাঁচাতে বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করে ভারতের অসংখ্য মন্দির এবং মসজিদ। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে বিদ্রোহীরা স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে সাভারকরের এই অবস্থান তাঁর আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী মানসিকতার-অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার এই মানসিকতার সঙ্গেই অস্পষ্টভাবে জড়িত ছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মনোভাব। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে সাভারকরকে আমরা পাই গত শতাব্দীর বিশের দশকে। 1923 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'হিন্দুত্ব' নামক একটি গ্রন্থ এবং এই পর্যায় থেকে সাভারকরকে আমরা দেখি হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে

তিনি আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন', 'সিক্স গ্লোরিয়াস ইপকস অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরী' প্রভৃতি। এ ছাড়া অসংখ্য বক্তৃতায় তিনি হিন্দু রাষ্ট্র এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক যুক্তি নির্মাণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তিনি তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ পর্যায়ে। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় (1919–20) ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছিল তুঙ্গে। খিলাফতিরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে আন্দোলনে সামিল হওয়ার পাশাপাশি ভূখণ্ড-নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের ধারণারও প্রচার শুরু করে। এরই তাৎক্ষণিক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাভারকর তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে তোলেন। তবে এটা মনে রাখা জরুরী যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে তিনিই যে একমাত্র পথিকৃৎ তা কিন্তু নয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের নানা প্রান্তে প্রধানত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু সংহতিবাদী পরিচিতির অনুসন্ধান এবং এই নিয়ে চর্চা লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা এবং সাভারকর

বস্তুত উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে স্বধর্ম স্বচেতনতার উন্মেষ ঘটে। জনজীবনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রান্তীয় অবস্থান তাদের সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার মনোভাব থেকে 'অতীত গৌরব' চর্চার দিকে ফিরতে বাধ্য করে। বাইরের জগতে ব্রিটিশ একাধিপত্যের মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী একান্ত ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুত্থানের দিকে আগ্রহী হয়। ব্রিটিশ বিরোধী পাল্টা ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির প্রকল্প নির্মাণের অঙ্গ হিসেবে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু পুনর্জাগরণের পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের প্রয়োজনে চিরাচরিত, বিচিত্রগামী হিন্দু ধর্মকে নতুনভাবে গড়ে পিঠে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী। বহুধা-বিভক্ত, বিচিত্র এবং বহুত্ববাদী হিন্দুধর্মকে একমাত্রিক ভাবে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রচলিত জনবাদী ধর্মসংস্কৃতির সীমাবদ্ধতাগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং একে পশ্চিমী যুক্তিবাদের নিরিখে আধুনিক করার চেষ্টা করেন। অন্ধবিশ্বাস, নিষ্ক্রিয় অধ্যাত্মবাদ চর্চার পরিবর্তে তাঁরা সক্রিয় বাস্তব রাজনীতিমুখী-হিন্দুধর্ম চর্চার ওপর জোর দেন। এই প্রকল্পের তাত্ত্বিক সূত্রপাত ঘটে বাঙলায়, প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের রচনার মধ্যে। এই সূত্র ধরেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অরবিন্দ এবং মহারাষ্ট্রে তিলক তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেন। প্রধানত দৃঢ়গোষ্ঠীবদ্ধ হিন্দুত্ব তত্ত্ব নির্মাণ, বিশেষ করে ভারতে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর থেকে পৃথক থাকার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে দেশীয় নাগরিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই পুনর্নির্মিত হিন্দুবাদী ঝোঁক। এইভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই সমরূপী-অবিভাজ্য হিন্দু ধর্মচেতনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই সমরূপী, একমাত্রিক ধর্মগোষ্ঠীসুলভ চিন্তাচেতনার দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীগুলিও যেমন মুসলিম ধর্মাবলম্বী ও 'অন্য' আরেক সমরূপী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে স্বদেশী আন্দোলনের পর্যায়ে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য চোখে পড়ে। এমন কি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়েও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্মও এই পর্যায়ে। ইতিমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং 'হিন্দু নেশনের' ধারণা জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে। অরবিন্দ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা দেন তার ভিত্তিই হচ্ছে হিন্দু ঐতিহ্য। সুপ্রাচীন এই হিন্দু সংস্কৃতিসঞ্জাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, তাঁর মতে মোটেও কোন সংকীর্ণ ধারণা নয়। বরং এর ব্যাপ্তি বিরাট, যার মধ্যে

ভারতীয় মুসলিমরাও খুব সহজেই স্থান পেতে পারে। এইভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনীতি চর্চার মূল উপজীব্য উপাদান হয়ে দাঁড়ায় একধরনের 'নব-উদ্ভাবিত' হিন্দু ধর্ম। সরাসরি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং তৎপ্রযুক্ত ভারতীয় মধ্যবিত্তের মতাদর্শগত আধিপত্য বিস্তারের অভীপ্সার সঙ্গেই এই নতুন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জড়িত। পরবর্তীকালে সাভারকরের রচনায় এই ধারারই দৃপ্ত অনুরণন লক্ষ্যণীয়।

সাভারকর এবং তাঁর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব

1923 সালে প্রকাশিত 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে সাভারকর তাঁর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে যেমন হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন এবং অন্যান্য জায়গায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারণার আরও বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে তিনি হিন্দু জাতি গঠনের পেছনে নানা ভৌগোলিক জাতিগত এবং ঐতিহ্যগত কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক, অবস্থান, একদিকে বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতমালা এবং অন্যদিকে অসীম মহাসাগর এই ভূখণ্ডকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই ভারতীয় জনগণের আত্মপরিচিতি, হাজার হাজার বছরের হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্মগ্রন্থ ভারতীয়দের আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত সভ্যতার উত্থান এবং পতন ঘটেছে কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা বজায় থেকেছে যুগ যুগ ধরে। সাভারকরের মতে মহাগুণী ছাড়া বিশ্বের আর কোন দেশের জনগণ এত সমসত্ত্বসম্পন্ন নয়। হিন্দুদের এই দীর্ঘলালিত সমসত্ত্বতাই তাদের দৃঢ়চেতা করে তুলেছে। অন্যদিকে মুসলিম বা ক্রীশ্চানরা এক একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হলেও ভৌগোলিক বন্ধনের অনুপস্থিতি হেতু তাদের একক জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে দেখা যায় না। তাই ভারতবর্ষ হচ্ছে হিন্দুদের পবিত্র পিতৃভূমি। এখানে মুসলিম, ক্রীশ্চান বা পার্সীরা এই পুণ্যভূমির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এরা যদি পিতৃভূমি হিসেবে ভারতকে মেনেও নেয় তাহলেও তাদের আনুগত্য কখনই এই দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের আনুগত্য থাকবে ভারতের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে অন্য কোন স্থানে।

সাভারকরের মতে হিন্দু জাতিকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে তিনটি বিষয়—রাষ্ট্র, জাতি এবং সংস্কৃতি। হিন্দু সংস্কৃতির অতীতগৌরবে তারা গর্বিত। এই উদ্দেশ্যে তিনি বৈদিক সভ্যতার প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন এবং এর পাশাপাশি ভারতীয় ইতিহাসের ছয়টি গৌরবময় যুগের উল্লেখ করেছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব নির্মাণের প্রেক্ষিতে সাভারকর কথিত ভারতের ইতিহাসের ক্রমপর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—(1) চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যা সারা ভারতবর্ষ-ব্যাপী বিস্তৃত হয়; (2) পুষ্যামিত্রের নেতৃত্বের উত্থান এবং এই যুগে বিদেশী গ্রীক শক্তিকে ধ্বংস করা হয়; (3) তৃতীয় যুগে বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব এবং বিদেশী শক আক্রমণকে প্রতিহত করে হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; (4) একই রকমভাবে মালোয়ার যশোধর্ম বিদেশী হূন আক্রমণকারীদের পরাজিত করে হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন; (5) পরবর্তীযুগে বহিরাগত মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করতে মারাঠাশক্তির উত্থান। সাভারকর উপরোক্ত পাঁচটি যুগের ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ষষ্ঠ যুগের উল্লেখ করেছেন যেখানে আশা প্রকাশ করছেন যে অতীত গরিমার বাহক ভারতীয় হিন্দুরা বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সমর্থ হবে।

এইভাবে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে সাভারকর হিন্দু ধর্মকে নতুনভাবে নির্মাণ করছেন। তিনি সচেতন যে অহিংসার ধারণার সঙ্গে হিন্দু জীবনচর্চা যুক্ত। কিন্তু বর্তমান অন্যায় অবিচার আর বঞ্চনার পরিবেশে হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত।

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতিকে অস্ত্রধারণ করতেই হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি মরাঠাশক্তির উত্থান এবং মোঘলশাসন বিরোধী শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক রণকৌশলের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মুসলিম শাসকদের অসহিষ্ণু ধর্মমত, আগ্রাসন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরাঠা শক্তির হিংসাত্মক প্রতিরোধ যে স্বাভাবিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই রকমভাবে ব্রিটিশ শাসনের বাস্তবতার নিরিখে এবং বাস্তব প্রয়োজনেই হিন্দুজাতিকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। রাষ্ট্রগত, জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত বন্ধন হিন্দুজাতিকে এমন এক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে উত্তরণ ঘটাবে যার চিহ্ন হবে 'হিন্দুত্ব'। এই হিন্দুত্বের ধারণা হচ্ছে আধুনিক হিন্দুবাদ যা চিরাচরিত হিন্দু ধর্মচর্চা থেকে স্বতন্ত্র। সাভারকরের মতে চিরাচরিত হিন্দুধর্ম মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং লৌকিক আচার-আচরণ সর্বস্ব ছিল; হিন্দুত্ব এই ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে এক আধুনিক সজীব সামাজিক রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়েছে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে এই তত্ত্ব সহায়ক। হিন্দুদের এক জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে সাভারকর বিভেদকারী বর্ণপ্রথাকে দূরীভূত করার কথা বলছেন। বর্ণপ্রথার অবসানের জন্য তিনি আন্তর্বৈবাহিক সম্পর্ক চালু করার কথা বলেছেন। সুসংবদ্ধ হিন্দুজাতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে সাভারকর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ চালু করার দাবী করেছেন। হিন্দু জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রে 'স্পৃশ্য' 'অস্পৃশ্য' বিভাজনের কোন স্থান নেই। হিন্দু ধর্মাচরণকারী সকলেই একই জীবনচর্চা, ধর্ম, সংস্কৃতিতে আবদ্ধ থাকবে। একমাত্র এই পথ ধরেই হিন্দু ধর্মের মানুষজনের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে সক্রিয় এবং সজীব ঐক্য।

সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' তত্ত্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ প্রসঙ্গে সাভারকর যে হিন্দুত্বের ধারণা নির্মাণ করেছেন তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও জীবনচর্চাগুলিকে একযোগে একটি বৃহত্তর একান্তবাদী (monolithic) গোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপিত করা। এর পাশাপাশি তাঁর এই প্রকল্পে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠী যেমন সনাতনী, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব এবং শিখরাও সমানভাবে সমাদৃত। 'হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করছেন যে, হিন্দুধর্ম হচ্ছে একটি সংস্কৃতি যার সঙ্গে উপরোক্ত ধর্মগোষ্ঠীগুলিও কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত। এই ধর্মগোষ্ঠীগুলিকে তিনি চিহ্নিত করছেন 'অবশিষ্ট হিন্দুধর্ম' হিসেবে। সার্বিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে জাতিগতভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে এই 'অবশিষ্ট হিন্দুধর্ম'গুলিও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তবে এগুলির সঙ্গে যতটুকু পার্থক্য হিন্দুধর্মের রয়েছে তা দূরীভূত করা প্রয়োজন। 'অবশিষ্ট হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এই যে তাদের স্বার্থ এবং অস্তিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একমাত্র এই পথ ধরেই ভারতের মত দেশে এক সার্বিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠা সম্ভব। এবং সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠীগুলি যদি চায় তবে তারা তাদের ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মূলধারার হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে লীন হতে হবে।

সাভারকরের এই রাজনৈতিক প্রকল্পে কিন্তু অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠী যেমন মুসলিম, ইহুদি বা ক্রীশ্চানদের প্রায় কোন স্থান নেই। কারণ তাদের আনুগত্য রয়ে গেছে দেশের বাইরে, আরবে বা প্যালেস্টাইনে। তারা যদিও বা ভারতকে পিতৃভূমি বলে মেনেও নেয় তাহলেও ভারত তাদের কাছে কোন 'পবিত্রভূমি' নয়। তাদের 'পবিত্রভূমি' দেশের বাইরে অন্য কোথাও। তাদেরকে যদি 'হিন্দু' হতে হয় তাহলে তাদেরকে এই দেশকেই যুগপৎ 'পিতৃভূমি ও 'পবিত্রভূমি' বলে মেনে নিতে হবে। তা না হলে এই দেশ তাদের নয়। 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে সাভারকরের মন্তব্য তাদের যদি দেশে থাকতে হয় তবে তাদের এটা মানতেই হবে যে এই দেশ ভারতবর্ষ হিন্দুদেরই দেশ।

আবার হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক সাভারকর হিন্দু ভারতে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব এবং ধর্মীয় পরিচিতি নিশ্চিহ্ন করার পক্ষপাতী নন। হিন্দু রাষ্ট্রদর্শনে তিনি তাদের ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। তাদের ধর্মাচারণের অধিকার তিনি মেনে নিচ্ছেন। তারা হিন্দু'দের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। তবে হিন্দুরাও তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকবে এবং এর ওপর সংখ্যালঘুদের হস্তক্ষেপ কোন মতেই মেনে নেওয়া যাবে না। অ-হিন্দু সংখ্যালঘুরা যেমন সংরক্ষণের সুযোগ ভোগ করবে তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাও নিজ ধর্ম সংস্কৃতি সংরক্ষণের সমান সুযোগ পাবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আলাদা কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে না। সাভারকরের মতে ভারতীয় মুসলিমদের স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা দেওয়ার অর্থ এদেশে তাদের আধিপত্যকে মেনে নেওয়া।

জঙ্গী হিন্দুরাষ্ট্র

বস্তুত সাভারকর এক যুগোপযোগী জঙ্গী হিন্দু জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। অহিংস আন্দোলনের প্রতি তিনি আস্থাবান ছিলেন না। ইতিহাসে সেই সমস্ত হিন্দুবীরদের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন যারা মহান উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হন। মহান, পবিত্র উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করা বৈধ এবং যথাযথ। জঙ্গী হিন্দুবাদী মতাদর্শ গড়ে তোলার সপক্ষে, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘোষণা করেন যে 'রাজনীতির হিন্দুকরণ' করা এবং 'হিন্দুধর্মকে সামরিকীকরণ' করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার কথা তিনি বলেন। তাঁর যুক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে ভারতীয় হিন্দুরা সামরিক কলাকৌশল আত্মস্থ করে ক্রমাগত জঙ্গী হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সমর্থন করে সাভারকর এবং তাঁর হিন্দু মহাসভা 1942-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করতে অস্বীকার করে।

সাভারকর তাঁর হিন্দুরাষ্ট্র তত্ত্বে গান্ধীবাদী বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্ব বা মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য সামূহিক ঐক্যবদ্ধ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাকে কোনমতেই বিকেন্দ্রীকৃত বা শ্রেণীবিভাজিত করা যাবে না। ভারতীয় হিন্দুরা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উপস্থাপিত করবে। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর কয়েকবছর আগেই সাভারকর স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে ভারত মোটেও কোন সমজাতীয় দেশ নয়। 1937 সালে অধিষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তিনি মন্তব্য করেন যে ভারত একটি দ্বি-জাতি সম্বলিত দেশ। এখানে দুটি পরস্পর বিরোধী জাতি, হিন্দু এবং মুসলিম বর্তমান। যদিও পরবর্তীকালে হিন্দুমহাসভা ভারত বিভাজনের বিরোধিতা করে। সাভারকর অনুপ্রাণিত হিন্দু মহাসভার দাবী ছিল এই যে একমাত্র হিন্দুর রাষ্ট্রের ধারণাই ভারতের জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বা হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণাই ভারতের জনগনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বা হিন্দুবাদের মধ্য দিয়েই ভারতে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্বাধীন ভারতে সংবিধান নির্মিত হওয়া উচিত একমাত্র হিন্দু ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অনুসরণ করেই।

আধুনিক হিন্দুবাদী রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সাভারকরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি অসমস্বর, অসংলগ্ন হিন্দু জীবনচর্চার বিচিত্র ধারাকে সংহত করে এক একমাত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিণত করেন এবং চিহ্নিত করেন 'হিন্দুত্ব' বলে। আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে 'হিন্দুত্বে'র উত্থান স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এইভাবে সাভারকরের তত্ত্ব প্রধানত মুসলিম এবং অন্যান্য অ-হিন্দু ধর্মগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত এক আধুনিক সুসংবদ্ধ হিন্দুজাতি গঠনের মতাদর্শ। অবশ্য এর পাশাপাশি অসমস্বর, একমাত্রিক মুসলিম ধর্মগোষ্ঠী নির্মাণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত ছিল। এবং এই দুই বিপরীত গোষ্ঠীর

দ্বন্দ্ব কালক্রমে দুই জাতির দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। হিন্দু জাতিসত্তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতে ত্রিশের দশকে পাল্টা মুসলিম জাতিসত্তার তাত্ত্বিক মতাদর্শ গড়ে তোলেন মহম্মদ ইকবাল, রহমত আলী এবং অন্যান্যরা। দুই বিপরীত ধর্মীয় মতাদর্শের উত্থান, প্রতিযোগিতা এবং বিরোধ অবশেষে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভাজন আনে, দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সাভারকর

স্বাধীনোত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রের পুনর্গঠন প্রসঙ্গে সাভারকরের একান্ত নিজস্ব কিছু কর্মসূচী ছিল। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তায় আপ্লুত সাভারকর এক সুদৃঢ় শক্তিশালী ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও শিল্পায়নের অবাধ বিস্তারের পক্ষে ছিলেন। উন্নয়নে বাধাসৃষ্টিকারী যাবতীয় প্রচেষ্টা, স্ট্রাইক, ধর্মঘট ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার দাবী তিনি জানান। রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের চেষ্টা করবে। দেশব্যপী হিন্দু সাংগঠনিক ঐক্যকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং কৃষকদের সংরক্ষণের কথা বলেছেন। হিন্দু রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে অহিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে প্রতিহত করে হিন্দু পেশাজীবি জনগণকে সংরক্ষণ করা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে সাভারকর দেখেছেন মূলতঃ একটি হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। তাঁর মতে এর অধিকাংশ সদস্যই হিন্দু। যে কজন মুসলিম সদস্য আছেন তাঁরা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নেই। তাই এই মুহূর্তে একমাত্র কর্তব্য হবে কংগ্রেসকে তার ভ্রান্ত 'ধর্মনিরপেক্ষ' অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে, তাকে যাবতীয় 'মুসলিমতোষণ' নীতি থেকে মুক্ত করে হিন্দুত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্মসূচী অবিলম্বে গ্রহণ করা না হলে শাসনের দায়িত্বে থাকা কংগ্রেস হিন্দুদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। এই উদ্দেশ্যে সাভারকর হিন্দু মহাসভাকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নেহেরুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তত্ত্বকে সাভারকর এবং তাঁর হিন্দুমহাসভা কঠোরভাবে সমালোচনা করে। তাঁদের মতে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কখনই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হবে না। তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্রের তত্ত্ব। কারণ বহুধাবিভক্ত ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে একমাত্র হিন্দু ধর্ম। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস এবং তার সহযোগী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাই হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হিন্দু মহাসভা সাধারণ নির্বাচনগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাজনৈতিক দল খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তবে সাভারকর কিন্তু আজীবন হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর (1966) কয়েক দশক পর অবশ্য হিন্দুবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটে।

সাভারকরের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের মূল্যায়ন

বস্তুত সাভারকরের হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ঔপনিবেশিক ভারতের এক বিশেষ পরিবেশের ফলশ্রুতি। ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকবর্গ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভাজিত করে, ভারতীয় জনগণকে প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ ইত্যাদি প্রশাসনিক বর্গে সীমাবদ্ধ করে। অথচ প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে, বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে মানুষজনের মধ্যে এই ধরনের কোন স্পষ্ট বিভাজন রেখা ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্রের স্বার্থে নিয়োজিত এই সমাজতত্ত্ব প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীর সীমানার মধ্যে অধিষ্ঠিত করে। ফলতঃ জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা ধর্মভিত্তিক বিভাজন এবং নির্দিষ্ট সীমানা। প্রাক্ আধুনিক বহুত্ববাদী অসংখ্য

ধর্মবিশ্বাসের স্থান গ্রহণ করে অনড় একত্ববাদী ধর্মীয় সীমানা। ভারতীয় জনগণের আত্মপরিচিতির চিহ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট ধর্মের উত্থান ঘটে এই পরিস্থিতিতে। গবেষকেরা মনে করেন এই ঔপনিবেশিক সমাজতান্ত্রিক প্রকরণ আত্মস্থ করেই ধীরে ধীরে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে পরবর্তীকালে যে পরস্পর বিরোধী ধর্মবোধ সৃষ্টি হয় সেগুলির পটভূমি সৃষ্টিতে এই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক সমাজতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ঔপনিবেশিকশক্তি বিরোধী পাল্টা প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে হিন্দু সভ্যতার অতীত গরিমাকে তুলে ধরতে দেখা যায়। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনে ও একাধিপত্যের মোকাবিলা করতেই পাশ্চাত্যসভ্যতার বিপরীতে প্রাচ্যসভ্যতার মহান ঐতিহ্যকে মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে একাধিক তাত্ত্বিক সমাজসংস্কারক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা নতুনভাবে অতীত চর্চা শুরু করেন। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের নিরিখে হিন্দু ঐতিহ্যকে প্রয়োজনমত গড়ে পিঠে নিয়ে অযাচিত লৌকিক উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে এক প্রাতিষ্ঠানিক একরূপী হিন্দু ধর্ম কাঠামো গড়ে তোলা হয়। সৃষ্টি হয় এক হিন্দুবাদী নির্দিষ্ট আত্ম-পরিচিতি যা অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উন্নততর বলে ঘোষিত। এই পুনর্নির্মিত অবিভাজ্য হিন্দু চেতনার সমৃদ্ধি ঘটে বিভিন্ন নেতৃত্ব, সংস্কারক, আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে। আর্যসমাজ, ভারতধর্ম মহামণ্ডল, হিন্দুমেলা এবং পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাত্ত্বিকদের মধ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মদনমোহন মালব্য এবং সাভারকর এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সক্রিয় এবং জঙ্গী করে তোলেন। তাঁরা মনে করেন জাতীয়তাবদী চেতনার স্বার্থেই হিন্দু সংহতির প্রয়োজন। তবে সমালোচকরা মনে করেন যে এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ আসলে উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠারই নামান্তর মাত্র। সাভারকর যতই জাতীয়তাবাদের স্বার্থে নিম্নবর্ণীয়দের হিন্দুধর্মের মূলস্রোতে যুক্ত করার নানা পন্থার কথা বলুন না কেন বাস্তবে এই কর্মসূচীগুলি শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয়দের আধিপত্য বিস্তারেরই এক আধুনিক রাজনৈতিক পন্থার অঙ্গ।

তৃতীয়তঃ সাভারকরের হিন্দু জাতীয়তাবাদ গঠনের যে প্রকল্প তা অনায়াসেই একটি আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং ধর্মকে আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শরূপে নির্মাণ করার ফলে উপমহাদেশে যে বিচিত্র ধর্মাচরণ, চিরাচরিত মূল্যবোধ, পরধর্ম সহিষ্ণুতার যে দীর্ঘলালিত ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল তা অনেকটাই বিনষ্ট হয়। অবাধ-ধর্মাচরণ, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আদান-প্রদানের যে পরিসর উপমহাদেশে গড়ে ওঠে তার মধ্যে অনেকান্তবাদী হিন্দু অথবা মুসলিম ধর্মের অবাধ এবং পারস্পরিক চলাচলের ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন যে প্রাক্ আধুনিকযুগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ছিল প্রায় বিরল এবং যদি কোন দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটতও তাও ছিল নিতান্তই সাময়িক এবং স্থানীয়। কিন্তু সাভারকর এবং তাঁর সহযোগী অন্যান্য ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিকদের হাতে বহুত্ববাদী ধর্ম একান্তবাদী ধর্মীয় মতাদর্শে পরিণত হয়। এই ধর্মীয় মতাদর্শের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর পরিচিতি-চিহ্ন জ্ঞাপন এবং এই ধর্মীয় পরিচিতির উৎস হিসাবে উপস্থাপিত করা হয় নির্দিষ্ট কোন 'পবিত্র পাঠ্য'-কে। এই 'পবিত্র পাঠ্য' এবং তার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ এবং রাজনীতি। এর উদ্দেশ্য কোন রাজনৈতিক স্বার্থ সাধন এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। সমস্ত ধর্মগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কেই এই বক্তব্য প্রযোজ্য। ধর্ম এখানে ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসেবে। সাভারকর ব্যক্তিগত জীবনে অবিশ্বাসী হলেও জনজীবনে ধর্মকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলেন এবং এর পরিণতি আমরা লক্ষ্য করেছি স্বাধীনতা

পূর্ব এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের সংগঠিত নানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের মধ্যে।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ, বিশেষ করে সাভারকর কর্তৃক নির্মিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চরম অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। এই মতাদর্শ বহুধর্ম বিশিষ্ট ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কর্তৃত্ব আনুগত্যের এক অসম বিন্যাস সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজ পরিচিতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত বিশেষ সুযোগ সুবিধার দাবী জানাতে থাকে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু গোষ্ঠীর গোষ্ঠী সচেতনতা এবং আধিপত্যবিস্তারের অভীপ্সা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাভারকর ঔপনিবেশিক ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মূলধারার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন। একান্ত সার্বিক হিন্দুবাদী অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি বহু জাতি, শ্রেণী এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক কংগ্রেসের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার কথা বলেন। তাঁর মতে বহু ধর্মগোষ্ঠী সম্বলিত জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার কংগ্রেসী প্রচেষ্টা বিভ্রান্তিকর। তবে এই কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই হিন্দু এবং হিন্দু সদস্যদের আত্মত্যাগের ওপরই এটি গড়ে উঠেছে। কংগ্রেসের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম নেতা আছেন। সাভারকরের মতে এই কয়েকজন মুসলিম সদস্যকে রাখার অর্থ এটা দেখানো যে কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম যৌথ সম্প্রদায় ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে। তাই হিন্দুমহাসভার উদ্দেশ্য হবে কংগ্রেসকে এই পথ থেকে সরিয়ে এনে তাকে পুরোপুরি হিন্দুবাদী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করা।

সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস অনুসৃত বিভিন্ন কর্মসূচীর সমালোচনা করে। তাঁর মতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী মেনে নিয়ে কংগ্রেস আসলে মুসলিম তোষণ নীতিই গ্রহণ করেছে। এবং এর ফলে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দুরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক হিন্দুর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে হিন্দু মহাসভার প্রার্থীদের নির্বাচন করা। তাঁর মতে প্রত্যেক মুসলিম ভোটদাতা শুধুমাত্র মুসলিম প্রার্থীকেই ভোট দেবে তাই প্রত্যেক হিন্দুর উচিত হিন্দুমহাসভার প্রার্থীদের ভোট দেওয়া। তাঁর যুক্তি ভারতের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী জাতি, হিন্দু এবং মুসলমান রয়েছে।

ভারতীয় হিন্দুরা মুসলিমদের বাদ দিয়েই একক শক্তিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। সাভারকর কোনদিন বিশ্বাস করতেন না যে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং জাতিগঠনের তিনি যে প্রকল্প রচনা করেন তাতে মুসলিমদের স্থান একান্তই প্রান্তীয়।

অথচ সূচনাকালে হিন্দু মহাসভা ছিল প্রধানত একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর হিন্দুবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রথমদিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি। মহাসভার প্রথমদিককার অধিবেশনগুলিতে বিভিন্ন কংগ্রেস নেতারা উপস্থিত থাকতেন। এমন কি আলীভ্রাতৃদ্বয় বা আবুল কালাম আজাদের মত গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও এতে অংশগ্রহণ করেন। 1924 সালে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে মহাসভা প্রধান মদনমোহন মালব্য মন্তব্য করেন যে এই সভা কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়। এর উদ্দেশ্য প্রধানত সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা। কংগ্রেস নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জাতীয় আন্দোলনকে সহায়তা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে 1926 সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর থেকেই মহাসভার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতে থাকে। হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই এর-একমাত্র

লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই পর্যায়েই সাভারকরের হিন্দুত্ব তত্ত্ব মহাসভার রাজনৈতিকতত্ত্ব এবং কর্মসূচী হিসেবে গৃহীত হয়।

1930-এর দশকের শেষের দিকে মুসলীম লীগের পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবীকে সাভারকরের নেতৃত্বে মহাসভা বিরোধিতা করে।

তবে উপমহাদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সমান্তরাল মুসলিম সম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব ইতিমধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক ভিন্ন মুসলিম জাতিসত্তার দাবী ইতিমধ্যে জোরদার হয়েছে। দেশব্যাপী ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনাকে স্তিমিত করতে গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতবিভাজন এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী মেনে নেয়। এরই প্রতিবাদে সাভারকর ঘনিষ্ঠ হিন্দু চরমপন্থী নাথুরাম গডসে গান্ধীকে হত্যা করে।

স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতেও সাভারকর এবং তাঁর হিন্দু মহাসভা অভিন্ন হিন্দুরাষ্ট্রের তত্ত্বে অবিচল থাকে। জাতীয় কংগ্রেস অনুসৃত "ধর্ম নিরপেক্ষতা" তত্ত্বের বিরোধিতা করে মহাসভা ঘোষণা করে যে একমাত্র হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভারতীয় জনগণকে উদ্দীপিত এবং সংহত করা যাবে। 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতি বাস্তবে জাতীয় সংহতি বিরোধী এবং এই নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেস কার্যতঃ হিন্দু বিরোধী মুসলিম তোষণ নীতি গ্রহণ করেছে। এর পরিবর্তন ঘটিয়ে চিরাচরিত হিন্দু শাস্ত্র এবং ঐতিহ্যকে উপজীব্য করে ভারতে এক গণতান্ত্রিক হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তুলতে মহাসভা সচেষ্ট। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকে হিন্দু মহাসভা বা তার সহযোগী অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জনমানসে খুব বেশী প্রভাব ফেলতে সক্ষম না হলেও 1980 এবং 1990-এর দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে নানা কারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।